ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 07. No. 01. June 2012

প্রসঙ্গ 'তরঙ্গভঙ্গ': ওয়ালীউল্লাহর নাটকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় নাট্যধারার প্রভাব

নূপুর দত্ত*

সারসংক্ষেপ: বাংলা নাট্যসাহিত্যে পাশ্চাত্য নাট্যমতবাদ সম্পর্কে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নিরীক্ষা এবং প্রয়োগ একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবীদার। যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য প্রথাবিরোধী নাট্যরীতির মধ্যে সংকেত-প্রতীকবাদ, অভিব্যক্তিবাদ, অস্তিত্ববাদ, নির্মাণবাদ, ফর্মালিবাদ ও অ্যাবসার্ডবাদ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য এই নাট্যরীতিসমূহের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটকে অস্তিত্ববাদ, অভিব্যক্তিবাদ ও অ্যাবসার্ডবাদ প্রভাবিত নাট্যরীতিসমূহের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। তবে নাট্যরচনার পটভূমি হিসেবে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশজ প্রতিবেশ ও উপকরণকেই বেছে নিয়েছেন। এই রচনাটিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর দ্বিতীয় নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ'-তে উল্লিখিত ইউরোপীয় নাট্যমতবাদসমূহের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে শুধু অস্তিত্ববাদের কেন্দ্রীয় বক্তব্যই নয়, এখানে সচেতনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিব্যক্তিবাদী ও অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য। নাটকটির বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত নাট্যরীতিসমূহের প্রত্যক্ষ প্রভাব এর সন্ধান যে ক্ষেত্রগুলোতে পরিদৃশ্যমান সেগুলোকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে উপরিউক্ত মতবাদসমূহের পরোক্ষ প্রভাবের ক্ষেত্রগুলোকেও চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছি।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বলিষ্ঠ কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) কালজয়ী ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত। সমকালীন বাস্তবতার নির্মমতা, বীভৎসতা ও নৈরাশ্য থেকে উদ্ভূত হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ওয়ালীউল্লাহর চিন্তাধারা বিপ্লবী ও ব্যতিক্রমী। এই ব্যতিক্রমী চিন্তাধারা তাঁকে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল কৃতীপুরুষে পরিণত করেছে। বাংলা উপন্যাসে, ছোটগল্পে এমনকি নাট্যজগতেও উন্মোচিত হয়েছে এক অজ্ঞাত সম্ভাবনাময় দিগন্ত। তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে চেতনাপ্রবাহরীতি আর নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তা দ্বারা। পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তা ও আধুনিক নাট্যরীতি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দেশীয় সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজ বাস্তবতার রূপায়ণের মাধ্যমে সমাজ সংগঠন ও মানব অস্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কিত ধারণাকে নাট্যরূপ দিয়েছেন, যা ইউরোপীয় অস্তিত্ববাদ, অভিব্যক্তিবাদ ও অ্যাবসার্ডবাদের আলোকে পর্যবেক্ষণ ও

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

পর্যালোচনাযোগ্য। বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতার সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ, বর্তমান যুগের যন্ত্রণা ও হতাশার রূপায়ণ, অর্থহীনতার মধ্যে গভীর সত্যের অনুসন্ধান তাঁর নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক মাত্র চারটি। এদের মধ্যে একটি কিশোর-কিশোরীদের জন্য। তাঁর প্রতিটি নাটকেই ভিন্ন ভিন্ন ধারায় নিরীক্ষার ছাপ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' প্রকাশের মাধ্যমে ইউরোপীয় আধুনিক নাট্য-আন্দোলনকে আত্মীকৃত করে বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে স্বতন্ত্র নাট্যচেতনার প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়ালীউল্লাহ তাঁর উপন্যাস কিংবা অন্যান্য নাটকগুলোর ন্যায় 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকেও অন্তর্বাস্তবতাকে মুখ্য করেছেন এবং সেই সঙ্গে অস্তিত্ববাদ, অভিব্যক্তিবাদ ও অ্যাবসার্ডবাদ-এই তিন রীতির সম্মিলন ঘটিয়েছেন। 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলন্ত জজ সাহেব আসলে এক ফসিলীভূত পতিতভূমিরই রূপকল্প হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আবিষ্কার করতে চেয়েছেন জীবনের এক নতুন অর্থ, বেঁচে থাকার প্রেরণা। ফলে তাঁর নাটকে জীবন ও মৃত্যু একই মোহনায় এসে মিশেছে। এভাবে তাঁর নাটকে অস্তিত্ববাদ, অভিব্যক্তিবাদ ও অ্যাবসার্ডবাদের প্রয়োগ বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে এবং বাংলা নাট্যজগতকে স্তরান্তরিত করেছে বৈশ্বিক সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে অনায়ত্তপূর্ণ মর্যাদায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের মধ্যেই বাস্তববাদী নাট্যধারা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যধারায় পরিণত হলেও ইউরোপের সর্বত্র এবং সর্বস্তরে এই ধারাটি সাদরে গৃহীত হল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে অতিদ্রুত বাস্তববিরোধী রীতির বিভিন্ন ধারা ইউরোপের নানা স্থানে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বাস্তববিরোধী আন্দোলনে আদর্শবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নানা মত, সংকেত প্রতীকবাদ, অস্তিত্ববাদ, অভিব্যক্তিবাদ, ফর্মালিবাদ, নির্মাণবাদ ইত্যাদি। নানা ইজম বা মতবাদের ঘাত-প্রতিঘাতে দোদুল্যমান ইউরোপীয় নাট্যজগতে এ সময়ের অন্যতম প্রভাব সৃষ্টিকারী নাট্যকার বার্টল ব্রেশট (১৮৯৮-১৯৫৬)।[১] যুদ্ধোত্তরকালে জার্মানির অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক দুর্নীতি, শ্রমিক শ্রেণীর ওপর অত্যাচার, শোষণ ও অবিচার ফ্যাসিবাদের প্রতি তাঁর মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। রুশ বিপ্লবের সার্থকতা, শোষিত মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নব দিগন্তের সূচনা- এসব কিছু তাঁকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। এ সময়েই বাস্তবধর্মী মঞ্চরীতির প্রতিবাদে উল্লেখযোগ্য নাট্যরীতি অভিব্যক্তিবাদ ও অ্যাবসার্ড নাটকের উদ্ভব ঘটে। অভিব্যক্তিবাদ বা প্রকাশবাদের উদ্ভব ও বিকাশ জার্মানিতেই। জার্মানিতে অভিব্যক্তিবাদী নাট্যকারেরা প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এসে বিশ্ব থিয়েটারে পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করে। প্রত্যক্ষ সত্যকে অতিরঞ্জিত ও সম্প্রসারিত রূপে মঞ্চের মধ্যে বিস্তৃতি ও বিশালতা সৃষ্টি করা অভিব্যক্তিবাদী নাট্যকারদের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষের অন্তর্জগতিক সত্যকে প্রকাশ করার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। অভিব্যক্তিবাদীদের ন্যায় অন্তর্জগতেরই সত্য প্রতিষ্ঠাকালেহ বাস্তববিরোধী নাট্যকারগণ কেউ কেউ জ্যাঁ পল সাঁত্রে প্রবর্তিত অস্তিত্ববাদী দর্শন প্রভাবিত নবধারার নাট্যরীতির প্রবর্তন

করেন। অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল জীবনবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অস্তিত্ববাদীরা সমকাল চেতনা কামনা করেন অথচ বাস্তবের অনুকরণ পছন্দ করেন না। তবে নাটকের ফর্ম সম্পর্কে তাঁদের উল্লেখযোগ্য মন্তব্য চোখে পড়েনা।[২] কিন্তু অ্যাবসার্ড মঞ্চরীতি স্থান ও কালের সঙ্গতি ও পারম্পর্য একেবারে উপেক্ষা করে বাস্তবধর্মী মঞ্চের মঞ্চমায়ার বিরুদ্ধে। অখণ্ডচিত্র অপেক্ষা খণ্ডচিত্র ফুটিয়ে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে অস্তিত্ববাদী, অভিব্যক্তিবাদী ও অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির বিকাশ ঘটেছিল। বাংলাদেশের বাংলা নাটকে এই নাট্যরীতিসমূহের উন্মেষ ও প্রয়োগ ঘটে সত্তরের দশকে এসে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন এ সময়ের আধুনিক বাংলা নাট্য-নিরীক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ। ইউরোপীয় অস্তিত্ববাদী দর্শন তাঁর নাট্যচিন্তাকে দিয়েছে তাত্ত্বিক এক স্বতন্ত্র প্রেরণা, নাটকে প্রয়োগ করেছেন অভিব্যক্তিবাদী নাট্য কৌশল এবং হুবহু অনুকরণ না করলেও তাঁর নাটকে অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির ছায়াপাত পরিদৃষ্ট হয়। ডেনিশ দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ডের চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ পল সাঁর্ত্রে তার 'বিবমিষা' (La nausea, ১৯৩৮) উপন্যাসে অস্তিত্ববাদের প্রকাশ ঘটান। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'মাছি' (Les mooches) নাটকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের সম্মিলন দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই মতবাদের উদ্ভব ঘটে। পুরনো মূল্যবোধের বিপর্যয় এবং মানবতা বিরোধী ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবনৃত্য মানুষকে আশাহত করেছিলো। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা চতুর্দিকে অসামঞ্জস্য, অনৈতিকতা, অবিশ্বাস, উৎকণ্ঠ ও অর্থহীনতার মধ্যে জীবনের অন্য এক মূল্য আবিষ্কার করেছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে মানুষের অস্তিত্বকেই প্রধান করে দেখিয়েছেন। মানুষ সমাজবদ্ধ হলেও প্রত্যেকের জীবন নিঃসঙ্গতায় পরিপূর্ণ। বেঁচে থাকার প্রয়াসে সে দলবদ্ধ সংগ্রামের চেয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রামের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

বাস্তববিরোধী নাট্যরীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম নাট্যরীতি অভিব্যক্তিবাদী নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ জার্মানীতে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।[৩] মানুষের অন্তর্জগতের সত্যকে প্রকাশ করাই এই শ্রেণীর নাটকের বৈশিষ্ট্য। বিখ্যাত অভিব্যক্তিবাদী নাট্যকার জর্জ কাইজার (১৮৭৮-১৯৪৫) নিঃসঙ্গ বা একাকী মানুষ দ্বারাই জীবনের গভীর সত্যকে লাভ করা যায় মনে করেন।[৪] ব্যক্তির একান্ত অনুভূতি ও ভাবের বহিঃপ্রকাশই অভিব্যক্তি নাটকের মূল লক্ষ্য ছিলো। পরবর্তীকালে অভিব্যক্তিবাদী নাট্যধারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী অন্যান্য নাট্যধারাতেও প্রভাব ফেলেছে।

আলব্যের ক্যামু ১৯৪২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'মিথ অব সিসিফাস' গ্রন্থে একালের জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'যে জগতের কার্যকরণ বিশ্লেষণ করা যায় তা যত ত্রুটিপূর্ণই হোক আমাদেরই পরিচিত জগত।'[৫] কিন্তু, যে জগতে মানুষ অকস্মাৎ তার সমস্ত মোহ ও আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে সেখানে সে নিজেকে মনে করে বহিরাগত। মানুষের সঙ্গে তার জীবনের এই বিচ্ছিন্নতার বেদনা থেকে জন্ম নেয় Absurdity'র বোধ। উনিশ শতকের পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে ইউরোপে এবং আমেরিকায় এই ধরনের নাটকের উদ্ভব ঘটে।

এর উদ্দেশ্য ছিল অস্তিত্ববাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে মানুষের জীবন এবং আকাঙ্ক্ষার অর্থহীনতা প্রকাশ করা। প্রকরণ ও উপাদানের দিক থেকে absurdist-রা অস্তিত্বের অর্থহীনতা এবং সেই অর্থে এর ভয়াবহতাকেই প্রকাশ করেন।

দর্শনের দিক থেকে অ্যাবসার্ডিস্টগণ উত্তর অস্তিত্ববাদী দার্শনিক। উভয় শ্রেণীর তাত্ত্বিকদের কাছে জীবনের শূন্যগর্ভতা ও অর্থহীনতার দিকটি মূখ্য হয়ে উঠলেও অস্তিত্ববাদীদের সঙ্গে অ্যাবসার্ডিস্টদের মতপার্থক্য ছিলো স্পষ্ট। অস্তিত্ববাদীরা জীবন-বঞ্চনার ভিত্তির ওপর সাহিত্যের মধ্যে অবাস্তব কল্পনাসমৃদ্ধ আনন্দময় সৌন্দর্যের জগত নির্মাণ করতে চান। কিন্তু অ্যাবসার্ডিস্টরা সাহিত্যকে বাস্তবজীবন সম্পর্কবিহীন মনে না করলেও সাহিত্যকে জীবন সংগ্রামে পরাজিত সৈনিকের পলায়নের কল্পক্ষেত্র মনে করেন না। অন্যদিকে অভিব্যক্তিবাদীদের ক্ষেত্রে বহির্জাগতিক সত্ত্ব কর্তৃক উপলব্ধ বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটান সাংকেতিক চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে। অভিব্যক্তিবাদীরা প্রকাশরীতিতে কখনো বিমূর্ত, কখনো মূর্ত শিল্পরূপের সাহায্য গ্রহণ করেন। অস্তিত্ববাদীরা নাটকের সূচনা ও পরিসমাপ্তির ব্যাপারে প্রথাগত রীতির অনুসারী। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকের শুরু ও সমাপ্তি পরস্পর সংযোগশূন্য। এরা প্রচলিত শিল্পরূপে আস্থাহীন। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নির্ধারণে এই রীতির নাট্যকারগণ মনোযোগী না হলেও তাঁরা 'ব্যক্তিক বাস্তবতায়' বিশ্বাসী; এবং সে কারণেই একক ব্যক্তির মধ্যে রূপায়িত করেছিলেন সামাজিক সংকটের স্বরূপ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে ইউরোপে অস্তিত্ববাদ, অভিব্যক্তিবাদ ও অ্যাবসার্ড ভাবধারার যে প্রকাশ ঘটেছিল, আমাদের নাট্যাঙ্গনে তার প্রভাব প্রাথমিকভাবে অনুভূত হয় সাঈদ আহমেদের 'কালবেলা' (১৯৬২), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬২) এবং 'উজানে মৃত্যু' (১৯৬৩) নাটকের মাধ্যমে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম নাটক 'বহিপীর' (১৯৫৫) থেকে সর্বশেষ নাটক 'উজানে মৃত্যু' পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে বহির্বাস্তবতা এবং অন্তর্বাস্তবতার রূপায়ণে আধুনিক ও নতুন রীতি প্রতিষ্ঠাকালে স্বকীয় নাট্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটেছে। 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে এসেই অভিব্যক্তিবাদ ও সেই সঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটকের ছায়াপাতে তাঁর জীবনদর্শন ও জীবনবোধ সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। তাঁর 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকটি নিরন্ন জীবনের এক অতুল্য প্রতিভাস।[৬]

বাংলা নাটকে ষাটের দশকে যে ধারা প্রচলিত ছিল তা থেকে ভিন্ন এক ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর এই নাটকটি। যেমন করে 'চাঁদের অমাবস্যা' কিংবা 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে দেশজ পটভূমি উপজীব্য করে ব্যক্তির অস্তিত্বকে চেতনা প্রবাহরীতিতে রূপায়ণ করা হয়েছে, তেমনি করে 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকটিতেও দেশজ পটভূমিতে ভিন্ন আঙ্গিকে চিন্তার কাঠামো, প্রকরণশৈলী নির্মিত হয়েছে। এই নাটকটিতে অস্তিত্ববাদী নাট্যধারাকে যেমন করে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তেমনি করেই এ নাটকটিকে অভিব্যক্তিবাদী নাটকও বলা যায়। সর্বোপরি, এ নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাটকটি অ্যাবসার্ড আবহে রচিত।

স্বসমাজের বাস্তব অবস্থার চিত্রায়ণে লেখক প্রচলিত রীতি অনুসরণ না করে এমন এক রীতির সন্ধানে ব্রতী ছিলেন, যাতে বিষয়ের স্থাপত্য পরিবর্তিত হয়েছে, আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভিন্নতা। আমাদের ষাট দশকের বাংলা নাটকের ফর্মে সংযোগ ঘটেছে আন্তর্জাতিক আবহের।[৭] তিনি ইউরোপীয় নাট্যচেতনায় নিজের আদর্শকে পরিপুষ্ট করে নিয়েছেন। ইউরোপীয় আঙ্গিকে স্বসমাজের অবক্ষয়কে রূপায়িত করেছেন। ফলে 'তরঙ্গভঙ্গ'র বিষয়বস্তু দেশজ হয়েও এর চিন্তার যে আঙ্গিক তা দেশজ নয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম এই নাটকটি। যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ওয়ালীউল্লাহ শূন্যতা, হতাশা, মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, অবক্ষয়ের নৈরাজ্য ও বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত ইউরোপীয় জীবনবোধের সঙ্গে সমাজের শূন্যতা, অবক্ষয় তথা প্রতিকূলতাকে মিলিয়েছেন। এই নাটকে তেমন কোন ঘটনা নেই কিংবা থাকলেও খুবই সামান্য। ঘটনার কোন শুরুও নেই, সমাপ্তিও নেই। নাটকটির বাইরের যে ঘটনা, তা আমাদেরই চারপাশের সমাজের। এক দুর্ভিক্ষপীড়িত সমাজে আমেনা নামে এক নারী তার শিশুসন্তান ও রুগ্ন স্বামীকে খুন করেছে। এই ঘটনার সাক্ষী আবদুল সাত্তার নেওলাপুরী সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি, আদালতে অভিযোগ করেছে। জজ এই হত্যার বিচার করতে প্রস্তুত। এই হচ্ছে নাটকটির বহির্ঘটনা। কিন্তু নাট্যকারের অভিপ্রেয় সত্য ও মূল উদ্দেশ্য শুধু এই সামান্য ঘটনাটি নয়। কেন এই হত্যা, কেন এই গ্রাম্যতরুণী হত্যা করেছে কোলের শিশুসন্তান ও অসুস্থ স্বামীকে অন্তর্জগতের এই একটি জটিল সত্যকে লেখক ব্যাখ্যা করেছেন স্বপ্নদৃশ্যের অবতারণা করে এবং সেই সঙ্গে নাটকের চরিত্রগুলোর অন্তর্জগতের রূপ উন্মোচন করেছেন।

ব্যক্তির উন্মোচিত অন্তর্জগতের রূপায়ণে 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকটি পায় অভিব্যক্তিবাদী নাটকের অভিধা, তেমনি ব্যক্তিমানসের দ্বিধান্বিত অন্তর্চেতনার ঘূর্ণিপাকে ক্রমান্বয়ে দায়িত্ব সচেতন হয়ে ওঠা জজের প্রকৃত সত্য উপলব্ধি নাটকটিতে এনে দেয় অস্তিত্ববাদী দর্শনচিন্তা। জজসাহেব অস্তিত্বের পরিশীলিত ও বিশুদ্ধ সত্তাকে অনুভব করে উপলব্ধি করেন এই সমাজে নেওলাপুরীর ভূমিকা এবং হাজতবন্দী করেন নেওলাপুরীকে, কিন্তু যখনি তিনি অবগত হন যে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র পাঠানো হবে তখনি তিনি পুনর্বার অস্তিত্বহীনতায় পতিত হন এবং আত্মহত্যা করেন। 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের মুহাম্মদ মুস্তফা, যে নিজে বিচারক-তারই মত অস্তিত্ববিলুপ্তির আশঙ্কায় 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকের বিচারক জজ সাহেবকে উদ্বন্ধনরজ্জুতে দুল্যমান দেয়া যায়। আলবেয়ার ক্যামুর 'দি জু স্টোরি' (১৯৫৮) নাটকের জেরীর মত আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে জজসাহেব অস্তিত্বসংকট থেকে মুক্তির প্রত্যাশা করেছেন-মৃত্যু এখানে অস্তিত্বের স্বপক্ষে এক নীরব প্রতিবাদ।[৮] 'কাঁদো নদী কাঁদো'র খোদেজার নীরবে গভীর সংগোপনে আত্মবিলোপ ও 'তরঙ্গভঙ্গে' জনরোষে নির্বাক প্রতিবাদহীন আমেনার আত্মবিসর্জন জীবনের ওপর মৃত্যুকে জিতিয়ে দেয়।[৯] নিঃসঙ্গ ব্যক্তিসত্তার এই মৃত্যু নাটকে সুস্পষ্ট এবং সুতীক্ষ্ণ — "আহা! একাকী প্রান্তর অতিক্রম করতে চেয়েছিলো। দড়ির বন্ধনে

সে যাত্রার অবসান ঘটেছে"।[১০] জজ চেয়েছিলেন প্রকৃত অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের মাধ্যমে অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে জজ ব্যর্থ হয়েছেন। অস্তিত্বের দায়ভার বহনে অসমর্থ হয়েই তিনি অস্তিত্ব থেকে পলায়ন করেছেন।[১১] কেননা তিনি বুঝতে পারেন যে দোষীকে শাস্তি দেবার পরিবর্তে বিচারককেই বারবার হার মানতে হবে। জজের অস্তিত্বের পরাজয়ই এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। এখানে সার্ত্রে বর্ণিত অস্তিত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে জজের আত্মবিশ্লেষণ, আত্মজিজ্ঞাসাই এখানে উদ্দিষ্ট হয়েছে। কোন রকম বহির্সংঘাত এখানে কাজ করেনি। এই নাটকে জজ সাহেবের আত্মোপলব্ধি এবং এই উপলব্ধিজাত যন্ত্রণা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দার্শনিক মতবাদ হিসেবে ইউরোপে যখন হাইডেগার-সার্ত্রে-ক্যামুর অস্তিত্ববাদের প্রবল জোয়ার -সেই সময়েই 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকটি রচিত। 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং 'তরঙ্গভঙ্গ' প্রায় একই সময়ের রচনা এবং তত্ত্বগত দিক থেকে তারা পরস্পর পরস্পরের খুব নিকটবর্তী। তাঁর নাটকের ব্যক্তি অস্তিত্বপীড়িত সেই ব্যক্তি, যে পরিপার্শ্ব ও কার্যকরণ এড়িয়ে অস্তিত্ববাদী দায়িত্ববোধে আক্রান্ত এবং নিঃসঙ্গতায় গ্রস্ত।[১২] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এই নাটকে ব্যক্তির বহির্সত্তা অপেক্ষা অন্তর্সত্তাকে আবিষ্কারে অধিকতর উৎসাহী। এই অন্তর্সত্তাকে নাট্যকার সার্ত্রে প্রভাবিত অস্তিত্ববাদের সঙ্গে যুক্ত করে 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকের পরিকল্পনা করেছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাট্যরচনার ক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদী চিন্তা অনিবার্যভাবেই এসেছে, সেই সঙ্গে আঙ্গিক-বীক্ষণে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের ফর্ম-নিরীক্ষা সমান গুরুত্বে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যন্ত্রশিল্পের অতিরিক্ত প্রসারে পুঁজিবাদ আক্রান্ত বিপর্যস্ত মানব জীবনে দেখা দিল নানা অশান্তি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, মার্কস কথিত সমাজ বিপ্লব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিটলারের অভ্যুদয়, জার্মানিতে রাজনৈতিক নিধন ও গণহত্যা, পুঁজিবাদী সমাজের আত্মিক শূন্যতাবোধে সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে মানুষ যখন হতাশায় নিমজ্জিত প্রায়, তখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরাজিত সত্তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই হাইডেগার-সার্ত্রে-ক্যামু প্রভাবিত নাট্যকাররা অভিব্যক্তিবাদী ও অ্যাবসার্ড রীতিকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

অভিব্যক্তিবাদী রীতির উদ্ভব ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াজাত যুদ্ধপীড়িত মানবজাতির হতাশা, নৈরাশ্য ও অসাম্য থেকে। প্রথমত — এই রীতির প্রাথমিক উদ্ভবের কারণ ছিল যুদ্ধবিরোধী চেতনা, পরে এই চেতনার সাথে সংযোগ ঘটেছে প্রচলিত সমাজপ্রথার। সমাজবাদী-চিন্তা ধারণের মাধ্যমে অভিব্যক্তিবাদীরা এক আদর্শ জীবনের স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে সমাজবাদী চিন্তাকে সামনে রেখেই দুর্দশাগ্রস্ত এবং আতঙ্কিত অস্তিত্বের রূপায়ণের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর্সত্তাকে অনুধাবন করতে চাইলেন। ওয়ালীউল্লাহ অভিব্যক্তিবাদী নাট্যকারদের মতো বস্তুকে তার যথাস্থিত রূপে দেখলেন না-অতিশয় প্রত্যক্ষ বাস্তবের অন্তরালে যে অন্তর্নিহিত সত্য আছে (inner reality) তাকে উদঘাটন করতে চাইলেন। অন্যান্য অভিব্যক্তিবাদী নাটকের মত 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকেও

বিষণ্নতা, বিচ্ছেদ-বেদনা, তিক্ততা বা মনো-বিশ্লেষণই হয়ে উঠেছে নাটকের মূল উপজীব্য। এখানে নাট্যকার চরিত্রের অভ্যন্তরে বিরাজমান ভয়-ভীতি, শঙ্কা-ক্রোধ ইত্যাদি মৌল প্রবৃত্তিগুলোর উন্মোচন ঘটিয়েছেন। আমেনা এই নাটকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত। "কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামী আমেনা। গ্রাম্য মেয়ে, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ"।[১৩] যে আমেনার চতুর্দিকে একদা ছিল আলো, আলো এবং আলো-উদ্ভাসিত পৃথিবী, একদিন সে এই আলোকেই ঘৃণা করতে শুরু করে:

> ক্রমশ প্রতি সূর্যোদয়, প্রতি বসন্তের অপরূপ পুষ্পসম্ভার, আলোকিত প্রতি মুহূর্তকে সে ঘৃণা করতে শুরু করে। একদিন তার মনে হয়, সে ঘৃণা বহির্মুখী না হয়ে অন্তর্মুখী হয়েছে। চূড়ান্ত ঘৃণার মুক্তিপথ যেন আদিম অন্ধকারের মধ্যেই, অন্তরের গহ্বরেই যেন তার সমাপ্তি। আমেনাকে ফাঁসিতে চড়াবার জন্যে আজ এত সাজ-সরঞ্জাম এত হুলস্থুল। কিন্তু সে আওয়াজ তার কানে পৌঁছায়না, ইতিমধ্যে আমেনা সেখানে ফিরে গেছে।[১৪]

কেউ তাকে ভয় দেখাতে পারেনা কিংবা কেউ তাকে ছুঁতে পারেনা। আপন স্বামী-সন্তান হত্যার মাধ্যমে সে প্রকৃতপক্ষে স্বীয় অস্তিত্বকেই হত্যা করেছে। নিরূপায় আমেনা স্বামী-সন্তান হত্যা করে সকল পার্থিব শাস্তির উর্ধ্বে উঠে নির্বিকার নিমগ্নতায় স্বীয় অস্তিত্বকে নিয়ে গেছে। সমাজের কোন আইন তার এই সত্তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। অপরদিকে আইনের বিচারে জয় লাভ করলেও আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী ভীত।— "নিঃসন্দেহে আমারই জয় হয়েছে, কিন্তু এ জয়ে কোন তৃপ্তি পাচ্ছি না যেন। এ জয়ের ফল যেন ভীতি। কি অত্যাশ্চর্য পুরস্কার"।[১৫]

অভিব্যক্তিবাদীরা সমাজচিন্তাকে ব্যক্ত করলেও তা ছিল ব্যক্তিগত ভাববাদ আশ্রিত। এই ভাববাদ আবেগ প্রভাবিত নয়, বরং ব্যক্তির স্বীয় বুদ্ধিজাত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আমেনার সামাজিক নির্যাতনের উৎস খোঁজায় যতটা আগ্রহী ছিলেন, তার চেয়ে জজ সাহেবের বিষণ্নতা, একাকিত্ব ও ব্যর্থতায় নিমজ্জিত অন্তর্সত্তাকে প্রকাশরূপ দিতে বেশী উৎসুক। কারণ প্রচলিত জীবনে অনাস্থা, প্রথাগত রীতির উপরে অশ্রদ্ধা, হতাশা ও নৈরাশ্যের কারণেই নতুন এক প্রকাশকে প্রতিষ্ঠার বাসনা থেকেই অভিব্যক্তিবাদের জন্ম হয়েছিল। নাটকটির প্রায় প্রতিটি চরিত্র রহস্যময় এবং চরম ঔদাসীন্যে আবৃত। তারা সবাই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের বদলে হয়ে যায় অন্যরকম। তাদের অন্তর্সত্তা বাহ্যিক রূপের চেয়ে একেবারেই পৃথক ও বিপরীত। শেষ দৃশ্যের জজ, ভিখারিনী, নেওলাপুরী, যুবক প্রত্যেকেই স্বপ্নদৃশ্য থেকে ভিন্নরূপ নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। নাট্যকার এই দুই রূপের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। দৃশ্যপট, চরিত্র সবই একই রকম কিন্তু বাহ্যবস্তু ও অন্তর্বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য তার উল্লেখ সচেতনভাবেই করা হয়েছে। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে অন্তর্সত্তার প্রকাশক চরিত্রগুলো প্রথানুগ্যতার বাইরে অচেনা, অজানা চেহারা নিয়ে উপস্থিত। বৃহত্তর প্রকাশের দিকে অগ্রসরমানতার পথে বিষণ্নতা, প্রতিকূলতা ও একাকীত্বের বেদনা, চূর্ণ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির

হতাশাক্লিষ্ট ভঙ্গুর রূপ অঙ্কনই অভিব্যক্তিবাদীদের অন্যতম লক্ষ। জজ সাহেব চরিত্রটির মধ্যে এই হতাশাক্লিষ্ট ভঙ্গুর রূপই প্রত্যক্ষ করা যায়। স্বপ্নদৃশ্যই আসলে এই নাটকটির প্রকৃত ঘটনা কিন্তু শেষদৃশ্যের ঘটনা অর্ধবাস্তব ও অর্ধসত্য। মানুষ এই অর্ধবাস্তবতার জগতে বাস করে। বাস্তব ও প্রকৃত সত্য থেকে তাই সে বহুদূরে অবস্থিত।

বিশের দশকে এসে অভিব্যক্তিবাদীরা নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রকরণেও ছিলেন স্বতন্ত্র। সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা, বাস্তব ও স্বপ্ন—এ সবের ভেতর যে প্রত্যক্ষ বৈপরীত্য বিদ্যমান, তার প্রকাশ ও উপস্থাপনায় তাঁরা এমন রীতিপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন যা, অনেক সময়ই ছিল উদ্ভট।[১৬] এই উদ্ভট বা অসম্ভব থেকেই অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির উদ্ভব। যুদ্ধবিধ্বংসী বিরুদ্ধ সময় মানুষের মনে যে হতাশা, বিক্ষেপ, যন্ত্রণার জন্ম দিয়েছিল, অন্তর্সত্তার সাথে বহির্সত্তার প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বে মানুষের চিরায়ত নাটকের চিন্তাচেতনা ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। অ্যাবসার্ড নাটক মূলত এই বিষয়টিকেই উপস্থাপন করে। অস্তিত্ববাদী, অভিব্যক্তিবাদী ও অ্যাবসার্ডরীতি-এই ত্রিধারার নাট্যরীতির মূল উৎস একই স্থান থেকে-মানবজীবনের অসঙ্গতি, নৈরাশ্য, হতাশা, গভীর শূন্যতাবোধ, অর্থহীনতা ও ঈশ্বরবিচ্ছিন্নতাবোধ। অস্তিত্ববাদী নাট্যকার সাধারণত প্রথাগত পথেই মানুষের অস্তিত্বহীনতা ও অস্তিত্বমুক্তির কথা বলেন, কিন্তু অভিব্যক্তিবাদী বা অ্যাবসার্ড নাট্যকার প্রচলিত নাট্যধারা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সংগঠনে নির্মাণ করেন মানুষের নতুন সত্তা, নতুন অস্তিত্ব ও আশা-আকাঙ্ক্ষার নতুন চিত্র। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটক এই সূত্রে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। সমালোচকের ভাষায়- আমাদের নাট্যসাহিত্যে অ্যাবসার্ড নাটকের জন্মদাতা সম্ভবত তিনিই। 'তরঙ্গভঙ্গ' ও 'উজানে মৃত্যু'- কে অন্য কোন ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব।[১৭]

আয়োনেস্কোর 'দি চেয়ারস' নাটকে মানবিক অস্তিত্বের নিষ্ফল ব্যর্থতা নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকেও 'জজসাহেব' চরিত্রটির মাধ্যমে অ্যাবসার্ডরীতিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মানব অস্তিত্বের মূল সঙ্কটকে আবিষ্কার করেছেন কিংবা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। দৃষ্টিগ্রাহ্য যে বাস্তব প্রতিনিয়ত চোখের সামনে ঘটে চলছে, সেই বহির্বাস্তবতা বিচারের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের প্রায় সকল চরিত্রগুলো বিশেষ করে জজ সাহেবের অস্তিত্বের অনুসন্ধানে নাট্যকার মনোবিচারালয়ের অবতারণা করেছেন। মানব চরিত্রের এই রূপান্তর আয়োনেস্কোর নাটকেও লক্ষণীয়। তারা নিজেদের যেমন করে ভাবেন, নাটকের চরিত্রগুলো সেভাবেই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। আয়োনেস্কো অস্তিত্ববাদী সার্ত্রের মতই মনে করেন, মানুষের ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রে এক শূন্যতাই বিরাজ করছে। সার্ত্রে বলেন, "আমি নিজেকে যা করে তুলি আমি তাই - আমার কথা, কাজ, ধারণা থেকে বাদ দিলে আমি আর নেই"।[১৮] অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের বক্তব্যের সঙ্গে অস্তিত্ববাদী হাইডেগার, সার্ত্রে (Sartre), ক্যামু (Camus)-র দর্শনের অনেকখানি মিল আছে। 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে প্রত্যক্ষ বাস্তবের যথার্থ স্বরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে ওয়ালীউল্লাহ মূলত অ্যাবসার্ডনাট্যরীতিকেই অনুসরণ করেছেন। অ্যাবসার্ড

নাট্যকারগণ অস্তিত্ববাদী দর্শন দ্বারা আক্রান্ত ও প্রভাবিত হলেও কিছুটা ভিন্ন। একজন অ্যাবসার্ডিস্ট যুক্তিসঙ্গত উপায় বা উপাদানসমূহকে পরিহার করে মানুষের সার্বিক অবস্থার অর্থহীনতাকেই তুলে ধরেন। বিশৃঙ্খলা, আকৃতি-হীনতা, স্ব-বিরোধিতা ও অন্তসারশূন্যতা দিয়ে মানুষের প্রতিদিনের অস্তিত্ব গঠিত এবং এসবের মধ্যেই সত্য নিহিত।[১৯] আমেনার বিচার করতে এসে জজ সাহেবের আত্মানুসন্ধান, নিজ অস্তিত্ব আবিষ্কারের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া উদ্ভূত বিষণ্ণতা ও ব্যর্থতা সবই পরিচিত জগৎ থেকে ভিন্ন। প্রচলিত অবয়বের পরিবর্তে নাটকের অন্য চরিত্রগুলোও নতুনরূপে উন্মোচিত হয়। এমনকি জজ সাহেবের অস্তিত্বের যথার্থ উপলব্ধিজাত যন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত তাকে আত্মহত্যার দিকে চালিত করে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ চরিত্রের অন্তর্গত অবয়ব ও অন্তর্জাগতিক চেতনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে আলোচ্য নাটকে একটি স্বপ্নদৃশ্যের অবতারণা করেছেন। শেষদৃশ্যে এসে নাট্যকার বাস্তবিকভাবেই আদালতকে উপস্থিত করেছেন। বিচারক এখানে পূর্বের দৃশ্য দুটির মতো তন্দ্রাচ্ছন্ন বা ঘুমন্ত নন – বিচারালয়ের সর্বাধ্যক্ষ, যিনি প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার করতে সমর্থ। মৌলভী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী এক গ্রামীণ মানুষ – পূর্বের দৃশ্যের মত বিচারককে নিয়ন্ত্রণ করেননা, বিচারক তার কাছে ভীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র। ভিখারিনীও কোন দার্শনিক বা বিবেকতাড়িত কোন জিজ্ঞাসুসত্তা নয়, নিতান্তই জীর্ণছিন্ন পরিচ্ছদাবৃত, দরিদ্র ভিখারিনী, যদিও শেষদৃশ্যের মঞ্চসজ্জা প্রথম দৃষ্টিতে প্রথম অঙ্কের অনুরূপ মনে হয় কিন্তু একটু পরেই বোঝা যায় শেষ দৃশ্যটি বাস্তবেরই অনুসারী। কেন্দ্রীয় দুটি দৃশ্যই আসলে স্বপ্ন-প্রয়াণ, যে স্বপ্ন-প্রয়াণ আসলে প্রত্যক্ষবাস্তবের চেয়ে অধিকতর বাস্তব বা সত্য। অভিব্যক্তিবাদী নাট্যকারের মত অ্যাবসার্ড নাট্যকারও মানুষের মনোলোকের অবচেতন স্তরের ভাবনাকে বাইরে নিয়ে আসেন স্বপ্নের সাহায্যে-'তরঙ্গভঙ্গ' ওয়ালীউল্লাহ এই রীতিই অনুসরণ করেছেন।

'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে চরিত্রের মনোলোকে শিল্পের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফেলে জজসাহেবের অন্তর্লোকের চেতনাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন নাট্যকার। এভাবে অ্যাবসার্ড নাট্য-আবহে নাট্যকার আলোচ্য নাটকের বিষয়ভাবনা, প্রকরণ ও গঠনশৈলী নির্মাণের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্বাস্তবতার প্রতীকী প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ফলে নাটকটির প্রকরণ ও বিষয়, এর আধার ও আধেয় পূর্ববর্তী নাটক থেকে আলাদা। বাংলা নাট্যসাহিত্যে অবশ্য প্রতীকী প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' নাটকে পূর্বেই দেখা যায়। 'রক্তকরবী'র নন্দিনী কিংবা 'ডাকঘর'-এর শিশু অমলের কণ্ঠে যেমন মানবাত্মার আকুলতা ধ্বনিত হয়েছে তেমনি 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকেও যন্ত্রণা, হতাশা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও শূন্যতার মধ্যে মানবাত্মাকে তার চূড়ান্ত বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের নাটকে আধ্যাত্মিকতা প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ সামাজিক ও মানবিক আইন ও নিয়মকানুনের বেড়াজালে বন্দী মানবঅস্তিত্বের অসহায়তা ও সমস্যাকে

বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন 'ভিখারিনী' চরিত্রের সংলাপে উচ্চারিত হয়েছে জজের অন্তর্চরিত্রের এক পরিবর্তিত দিক –

> "না, তা এখন সম্ভব নয়। যেদিন আসামীর দীর্ঘ মিছিলে বিশ্বাস করতেন সেদিন সে লেবাসটা বললে ছাড়তে পারতেন। কিন্তু তাঁকে জজের সং সাজিয়ে তলে তলে হাসার দিন আপনার নাই। বলেছিনা, আজ তাঁর চোখের ঠুলিতে অনেক ছিদ্র। আজ তার কেল্লার ভেতরেও আলো ঢুকেছে। কী জানেন? আজ তিনি সজ্ঞানেই সে রঙের খেলা খেলতে চান। আজ আসামির মিছিলের ওপর দিয়ে তাঁর দৃষ্টি বয়ে যায়, কিন্তু নকল আসামিতে তিনি ভোলেননা। তাঁর এ দৃষ্টি অন্যত্র"।[২০]

অ্যাবসার্ড নাটকের মূল যে বৈশিষ্ট্য মানসিক অসঙ্গতি ও অস্তিত্বহীনতা - এ নাটকে পুরোপুরি আসেনি, বরং অস্তিত্বের সংকট ও নিরীক্ষাই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে।[২১] বুর্জোয়া সমাজের মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন, ঈশ্বর বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা ও চরম অস্তিত্বসংকটে নিমজ্জিত মানুষের অন্তর্লোকে যন্ত্রণাদগ্ধ রক্তক্ষরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যেই ইউরোপের নাট্যকাররা নির্মাণ করেছেন এই নবআঙ্গিকের নাট্যরীতি-অ্যাবসার্ড নাটকের। ওয়ালীউল্লাহ পাশ্চাত্য এই নাট্যরীতিকে অনুসরণ করলেও 'তরঙ্গভঙ্গ' যথার্থ অ্যাবসার্ড নাটক নয়। তিনি বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের প্রভাবে অ্যাবসার্ড নাট্যরীতিকে আদর্শ করেছেন-এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটেই 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে অনুপ্রবিষ্ট অ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষণসমূহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করা হয়ে থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়ে থাকে, অ্যাবসার্ডিস্ট নাট্যকাররা প্রচলিত শিল্পরূপে আস্থাহীন এবং জীবন পর্যালোচনায় কৌতুকমিশ্রিত অনেকটা নিরাসক্তভঙ্গীর অধিকারী। কিন্তু তাই বলে তারা জীবন ও সময় সম্পর্কে নির্লিপ্ত নন। বাহ্যত অ্যাবসার্ড নাটক অস্বাভাবিক মনে হলেও, এর গভীরে এক চূড়ান্ত সত্য নিহিত। স্বপ্নময় পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে এ নাটকে উদ্ভট অসংলগ্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। স্বপ্ন এখানে কোন সুস্পষ্ট ধারণার সঞ্চার করে না। সমাজসচেতন সমালোচনাধর্মী ব্যাঙ্গাত্মক সুরের সঙ্গে এ ধরনের নাটকে রয়েছে উদ্ভট রঙ্গরস ও কৌতুক, তবে এই রীতির নাটকের মূখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা বর্তমান জীবনের গভীরতর একটি স্তরের রহস্য উন্মোচনের প্রয়াসী। 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকেও এই বৈশিষ্ট্যটিই প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষ যে এই অর্থহীন জগতে একা এবং অর্থহীনতা ও অসম্ভাব্যতার মধ্যে তাকেই সমাধানের পথ বের করতে হবে - জজ চরিত্রটির মধ্যে সেই প্রচেষ্টা অ্যাবসার্ড নাট্যরীতিরই অন্তর্ভুক্ত। উদ্ভট নাটক সহজ সমাধানের কথা বলেনা, সমাধানের পথে ব্যক্তিকে নিজেই পরিচালিত হতে বাধ্য করে। ওয়ালীউল্লাহ একক ব্যক্তির মধ্যে সন্ধান করেছেন সামাজিক সংকটের স্বরূপ, আবার সমাজের বিনষ্ট প্রথানুগ রীতিকে প্রায়শই ব্যঙ্গ করেছেন নাটকে, যেমন করে উপন্যাসেও। মানুষের অস্তিত্বকে সামনে রেখেই তিনি মানুষের পাপপূন্যবোধ এবং নীতি-নৈতিকতার ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন:

> "পাপপূন্যের কথা নিয়ে আমেনা মাথা ঘামায় না। কার সাহস পাপপূন্যের কথা তোলে তার সামনে? কার সাহস তাকে জিজ্ঞাসা করে, কেন সে তার স্বামীকে বিষ দিয়েছে? কেন সে তার সন্তানের জান নিয়েছে"?[২২]

এভাবেই 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে ওয়ালীউল্লাহ উচ্চতর এক মানবিক সত্তার সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন একই সঙ্গে পরোক্ষভাবে হলেও 'বহিপীর', 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকের মাধ্যমে অন্য অনেক সমাজ সচেতন নাট্যকার অপেক্ষা অগ্রসর চিন্তার পরিচয় প্রদান করেছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে:

> "ওয়ালীউল্লাহ সমাজ সচেতন এবং তাই জিজ্ঞাসু। যে নারী সন্তানকে খাদ্য দিতে না পেরে তাকে হত্যা করে সে কি অপরাধী? তার দায়ভাগ সামাজিক ব্যক্তির (তাই আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীর বিবেকী হাজতবাস), এমনকি বিচারকের (তাই স্বয়ং জজেরই ফাঁসিকাঠে বিবেকী আরোহণ)। ——— বিচারসভা স্বপ্ন বা কল্পনার রূপ নেয় এক বিশাল অবচেতন রঙ্গমঞ্চে-যেখানে মানুষের বিবেক, পাপবোধ, অপরাধবোধ রূপ ধরে অনুষ্ঠিত হয়। বিচারক যেখানে পরিণত হয় বিদূষকে, ভিখারিনী দার্শনিকে, অকৃতকার্য এক তুচ্ছ কন্ট্রাকটর বিবেকে, ধার্মিক নেওলাপুরী রহস্যময় হত্যার সহযোগীতে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত আবার সবই পরিণত হয় স্বাভাবিক প্রচল ও গতানুগতিতে। — আমরা অবাক হয়ে দেখি এই-ই হয় – সরকার পরিবর্তন হয়, রাজনীতিকেরা স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, বুদ্ধিজীবীরা বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুত মত বদল করেন, কিন্তু সমাজব্যবস্থায় এক তিল পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না। যে জননী নিরূপায় হয়ে শিশুকে হত্যা করে, তার ঠিকই ফাঁসি হয়ে যায়"।[২৩]

এভাবে ব্যক্তির অন্তর্জাগতিক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজের বহির্লোকের সমস্যাও। চরিত্রের এই সব মূল্যায়ন, প্রথানুগ সামাজিক বাস্তবতাকে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন অভিব্যক্তিবাদী নাটকেরই বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাবসার্ড নাটকেও এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

তথ্যনির্দেশ:

১। জিয়া হায়দার, 'নাট্যকলায় বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার', নভেম্বর ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-৭২।

২। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্য বিবেক', ১৯৭৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ.-২৪৯।

৩। ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, 'নাট্যতত্ত্ব-বিচার', ২৬ শ্রাবণ, ১৩৯১ বাংলা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ.-২৩৬।

৪। জিয়া হায়দার, 'নাট্যকলায় বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার', নভেম্বর ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-৫৫।

৫। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্য বিবেক', ১৯৭৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ.-২৪৯।

৬। সেলিম আল দীন, 'বাংলাদেশের নাটক: সংকট ও সম্ভাবনা, থিয়েটার স্টাডিজ', সেলিম আল দীন সম্পাদিত, সংখ্যা-৮ জুন ২০০১, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.-৯।